Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অবক্ষয় ও উত্তরণ

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হাবিব রহমান
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.9
Pages	142-146
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অবক্ষয় ও উত্তরণ – আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রকাশক – প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশন, প্রচ্ছদ – আনোয়ার ফারুক, প্রকাশকাল – ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, মূল্য : ৭৫.০০ টাকা

বাংলাদেশ নামক আমাদের এই রাষ্ট্রটি যে একটি সর্বব্যাপী অবক্ষয়ে ক্লিষ্ট, রুগ্ন ও অবসাদগ্রস্ত সে বিষয়ে কয়েক দশকের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা ছাড়া আর কেউ বোধ করি দ্বিমত পোষণ করেন না। অবশ্য ক্ষমতাসীনদের মুখ থেকেও কখনো কখনো সচেতন বা অসচেতনভাবে সত্য বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু অবক্ষয় নিরসনের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছে না, বরং দিন দিন তার মাত্রা বেড়ে চলেছে। ফলে হতাশ্বাস মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে তারা এখন আর স্বপ্ন দেখে না।

এই অবস্থা কোনো জাতির জীবনে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে পারে না, বরং তাকে শক্তিহীন ও নিস্তেজ করে দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে অন্য অনেকের সঙ্গে লেখক–বুদ্ধিজীবী–ভাবুকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বাংলাদেশে এই ভূমিকা যথেষ্ট পালিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁদের অধিকাংশই কোনো–না–কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড় বৃত্তিতে নিমগ্ন অথবা কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের লোভের জালে আবদ্ধ। হাতে গোনা যে দু'একজন লেখক–ভাবুক দলাদলি ও স্বার্থসাধনের ঊর্ধ্বে থেকে এই রুগ্ন দেশটির প্রকৃত রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের উপায় সন্ধানে আন্তরিকভাবে প্রণোদিত, চিন্তাশীল প্রবন্ধকার আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের অন্যতম। তাঁর *অবক্ষয় ও উত্তরণ* গ্রন্থটিতে অবক্ষয়ক্লিষ্ট বাংলাদেশের প্রকৃত রূপচিত্র তুলে ধরে তা থেকে উত্তরণের উপায় সন্ধান তিনি করেছেন।

আবুল কাসেম ফজলুল হক স্বদেশের ও বিশ্বমানবের মঙ্গল ভাবনায় ভাবিত প্রবল আশাবাদী লেখক। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে মানুষ। নিজেকে তিনি গঠন করেছেন রেনেসাঁসের মর্মচেতনা দ্বারা। মানুষকে তিনি উন্নীত দেখতে চান যথার্থ মানুষ রূপে। মানবতার অবনয়ন তাই তাঁকে উৎকণ্ঠ করে। স্বদেশের মারাত্মক মানবিক অবনয়নের মধ্যে যেহেতু তাঁর বসবাস, সেহেতু নিজের দেশ সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা স্বভাবতই বেশি। চারপাশের অন্যায়–অবিচার–মিথ্যা–নিচতা–হীনতা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে, যন্ত্রণায় কাতর করে। সেই ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত হৃদয়ের গভীর তল থেকে জন্ম নেয় তাঁর

লেখা, বেরিয়ে আসে পঙক্তির পর পঙক্তি। আবুল কাসেম ফজলুল হকের লেখার সঙ্গে পরিচিত পাঠকমাত্রই এ সত্য উপলব্ধি করবেন। সে-উপলব্ধি অবক্ষয় ও উত্তরণ বইটি পড়লে আরও প্রগাঢ় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মোট নয়টি প্রবন্ধের সমবায়ে প্রস্তুত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটি। প্রবন্ধগুলি সবই পূর্ব-প্রকাশিত। বক্তব্যের উপযোগিতা বিবেচনা করে এগুলি একত্রে গ্রন্থিত করা হয়েছে। রচনাগুলির শিরোনাম যথাক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয় ও বাঙলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, নৈতিক চেতনা : ধর্ম ও মতাদর্শ : প্রগতি ও অধোগতি, আলবার্ট আইনস্টাইন : সমাজ ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, বাঙালির রাজনৈতিক প্রতিভা, বাংলাদেশে ভালো নেতৃত্বের অভাব কেন, চৌ এনলাই : মাও সেতুঙের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, জনশিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি এবং বাঙলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য। এগুলোর মধ্যে দুটি লেখা অনুবাদ—আলবার্ট আইনাস্টাইনের ও চৌ এনলাইয়ের। লেখা দুটি এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ মৌলিক প্রবন্ধগুলির কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সঙ্গে এ দুটি লেখার বক্তব্যগত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাদৃশ্য। অবক্ষয় ও উত্তরণ-এর রচনাগুলি নানা বিষয়ক ও নানা নামে চিহ্নিত হলেও সেগুলির একটি কেন্দ্রগত বক্তব্য আছে। সে বক্তব্যের সার-সংকলন করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা টিকে থাকা পর্যন্ত পৃথিবীতে শক্তির যে ভারসাম্য বজায় ছিল তা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে বিনষ্ট হয়ে বিশ্বব্যবস্থা এখন এককেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই একক শক্তির মোড়ল হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে পুঁজিবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেই ব্যবস্থাই এখন পৃথিবীতে সর্বেসর্বা। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীন কিন্তু দুর্বল দেশগুলির উপর পরোক্ষ শাসন ও তাদেরকে নির্ভরশীল করে শোষণ করা। এসব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কার্যত অর্থহীন। বাংলাদেশ এই জাতীয় দেশের মধ্যে অন্যতম।

কোনো দেশের উপর কর্তৃত্ব করতে হলে ও তাদের পরনির্ভরশীল করে রাখতে হলে গোড়াতেই যে কাজটি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে সে দেশের বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাতে কোনো নৈতিক চেতনা গড়ে উঠতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। যা কিছু ভালো তার অন্তর্মূলে রয়েছে নৈতিক চেতনা। দেশকে ভালোবাসা, দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি সবই নির্ভর করে মানুষের নৈতিক চেতনার উপর, যার অন্য নাম বিবেকবোধ। আদিপত্যবাদীরা ভালো করেই জানে বিবেকবোধবর্জিত স্বার্থপরায়ণ

রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হলে সে-দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট করা কঠিন কাজ হবে না। আর এ কাজটি করা সম্ভব হলে দীর্ঘকালব্যাপী ঐ দেশটির উপর খবরদারি চালানো সম্ভব হবে। কেননা কোনো জাতির নৈতিক চরিত্র একবার যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার পুনর্গঠন দীর্ঘকালের কঠিন সাধনার ব্যাপার।

বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থার দিকে তাকালে উপরের কথাগুলি যে কতখানি সত্য তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সর্বব্যাপী অধঃপতন যে দেশটিকে গ্রাস করেছে এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক এই অধঃপতনকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে ভালো দল ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দেশটিকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ধ্বংস নেমে এসেছে এর অর্থনীতিতে, শিল্পে, প্রশাসনে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে। যদি এ সবের আমরা পুনর্গঠন অথবা নতুন করে নির্মাণ করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন হবে যোগ্য ও উন্নত চরিত্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু কিভাবে গড়ে উঠবে সেই নেতৃত্ব? তা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা লেখক বলেছেন। উল্লেখ করেছেন টলস্টয়ের সত্যসম্ভূত বাণী : জনসাধারণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির ভিত্তি। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ সত্যিই তো অজ্ঞ। যাদের সচেতন হওয়ার কথা তারা তো সচেতন কেবল তাদের স্বার্থ সম্পর্কে। তাহলে? এই প্রশ্নের সূত্রে চৌ এনলাইয়ের লেখাটির অনুবাদ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা দরকারি সন্দেহ নেই ; কিন্তু লেখক নিজে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা দিতে পারেননি অথবা দেননি। কেবল বলেছেন যে, পৃথিবীর আরও অনেক জাতির মতো "বাংলাদেশের জনজীবনেও দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের পর সঙ্কটমুক্ত সমৃদ্ধ নতুন যুগের সূচনা হবে বলে আমরা আশা করি—যদিও কিভাবে তা হবে সে সম্পর্কে আজও কিছুই আমরা জানি না। পথের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াতে হবে, চেষ্টার পর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—এটুকুই শুধু এখন বলতে পারি।" (পৃ. ৬৬-৬৭)

আবুল কাসেম ফজলুল হক আশাবাদী লেখক। পথের দিশা তিনি দিতে না পারলেও পথ-সন্ধানে তাঁর ক্লান্তি নেই। অবশ্য তাঁর লেখায় এটুকু ইংগিতময় হয়ে ওঠে যে, দেশের মুক্তির জন্য যোগ্য নেতৃত্বের এমন একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হওয়া দরকার যে দলের পাথেয় হবে উন্নত নৈতিক চেতনা, দেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা, বাস্তববাদিতা ইত্যাদি সৎ গুণ। আমরা লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে আদর্শহীন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের দ্বারা জগতে বড় কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

'নৈতিক চেতনা : কর্ম ও মতাদর্শ : প্রগতি ও অধোগতি' এ গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। দীর্ঘ এই রচনাটিতে লেখক মানব-মনে নীতিচেতনার জন্মেতিহাস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে এর স্বরূপ-প্রকৃতি তুলে ধরেছেন, এবং ধর্ম

ও মতাদর্শের সঙ্গে এর সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম ও মতাদর্শ (মতাদর্শ বলতে লেখক সেই জাতীয় মতবাদকে বুঝিয়েছেন যার সঙ্গে ঈশ্বরের কিংবা অলৌকিক কোন কিছুর অনুষঙ্গ যুক্ত নেই) উভয়েরই মূলে রয়েছে নৈতিক চেতনা। সুতরাং এই চেতনা না থাকলে ধর্ম বা মতাদর্শ উভয় ক্ষেত্রেই প্রগতির বদলে অধোগতি দেখা দেয়। লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

কামিনী রায়ের বিখ্যাত নীতি-কবিতা "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/ এ জীবন মন সকলই দাও/ তার চেয়ে সুখ কোথাও কি আছে/ আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"—এর যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ভিন্নতর ব্যাখ্যা সম্ভব বলে আমাদের ধারণা। উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "এই উক্তি সর্বাবস্থায় সকল মহলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। কেউ কখনো প্রশ্ন তোলে না—'পরের কারণে কেন আমি আপন স্বার্থ বলি দেব?' 'কেন নিজের ন্যায়স্বার্থের কথা ভুলে যাব?' 'আত্ম প্রতিষ্ঠার চেয়ে আত্মত্যাগ কি মহৎ?' আমার মতে, কামিনী রায়ের উক্ত কবিতায় বিধৃত আত্মত্যাগ ও সুখ সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। আসলে যা দরকার তা হল নিজের জীবনে এবং অন্য সকলের জীবনে হীনস্বার্থকে প্রতিহত করার ও ন্যায়স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার দৃষ্টিভঙ্গি।" (পৃ. ৫৬)

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটিতে লেখক যা বলেছেন কবিতার উদ্ধৃতাংশটির তো সেভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে কেবল আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করলে কবিতা থেকে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাময় কোনো অর্থ তো আমরা পাবো না। আমাদের ধারণা কামিনী রায় স্বার্থ শব্দটি স্বার্থপরতা অর্থে ব্যবহার করেছেন, যা অবশ্যই নিন্দনীয়। 'আপনার কথা ভুলিয়া যাও' বলতে কবি আত্মপরতার কথা বুঝিয়ে থাকতে পারেন। এভাবে বিচার করলে কবিতাংশটি তাৎপর্যমণ্ডিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য হতে পারে বাংলাদেশের বহু লেখক-বুদ্ধিজীবী যেখানে স্বার্থপরতায় লিপ্ত সেখানে আবুল কাসেম ফজলুল হক কেন আখের গোছানো থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, রাত জেগে শরীর ও মেধা ক্ষয় করে দেশের সামাষ্টিক স্বার্থের কথা ভাবছেন? এতে কি কোনো সুখানুভব তিনি করেন না?

এ গ্রন্থে অনুসৃত বানানরীতি সম্পর্কে আপত্তির কারণ আছে। আসলে লেখক কোনো রীতিই অবলম্বন করেন নি। ভূমিকায় নিজেই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোনো বানানরীতি যদি অবলম্বন করা না হয় তাহলে তো বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং এ গ্রন্থে তা দিয়েছেও। যেমন তিনি ঈ-কার ব্যবহার করলেও ঊ-কার ব্যবহার করেন নি। এর কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। অথচ 'ভূমিকায় ঊ-কার

দিয়েই লেখা হয়েছে। এ বহয়ে ণ-ত্ব বিধি অস্বীকৃত হলেও প্রচ্ছদে ও অভ্যন্তরে গ্রন্থনামে 'উত্তরণ' শব্দটি ণ-দিয়ে লেখা হয়েছে। লেখক প্রচলিত বানানরীতি যদি না-ও মানতে চান তবু তাঁর নিজস্ব পন্থায় একটি নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি না মানলে চলবে কেন?

গ্রন্থভুক্ত রচনাসমূহের যেহেতু একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্য আছে, সেহেতু বক্তব্যে কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমাদের বিবেচনায় সেটি অস্বাভাবিক নয়। লেখক বহু যত্নে, বহু শ্রমে, বহু মনীষীর চিন্তা ধারার সংশ্লেষণে অবক্ষয়ক্লিষ্ট বাংলাদেশের মুক্তির যে পথসন্ধান করেছেন তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে বলে ধারণা করা যায়।*

---

* হাবিব রহমান, সহকারি অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া